Website: https://www.parthasarathipatrika.com

২৬ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ / 24.05.2022

–: সম্পাদক :–

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
স্বাধীন তুমি	শ্রীমা
শ্রীঅরবিন্দের সাধনা	শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বুদ্ধ কথা	শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
শিখগুরু অমরদাসের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
জীবনের খেলাঘরে	শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য
খুঁজে ফেরা	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

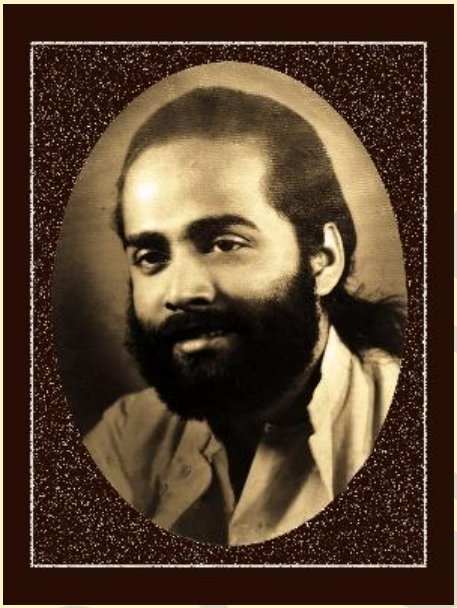

(10.03.1926 - 24.11.1986)

প্রীতি-কণা

"অহং ভাব সকল বন্ধনের মূল। স্বার্থের বশে কর্ম না করে কোনরূপ অহং চিন্তা না রেখে ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করলে আমরা এই বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারি।"

DO NOT COPY

(15.10.1936 - 24.10.2019)

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

"পার্থসারথি" তিরিশ বছরে পড়লো আষাঢ়, ১৩৯৬ (জুন, ১৯৮৯) সংখ্যায়। এই পত্রিকাটি ছিল শ্রীপ্রীতিকুমারের সযত্নে পালিত সন্তানের মত। আজকাল আমরাও পার্থসারথিকে ভালবেসে ফেলেছি। মনে প্রাণে এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে চলেছি। একে বড় করে গড়ে তোলবার জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম করা দরকার আমরা তা যথাসাধ্য করে চলেছি। তাই শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রয়াণের পরও আড়াই বছর কাটাতে পেরেছি। বিশ্বাস রাখি ভবিষ্যতেও পারবো।

কবি বলেছেনঃ

"সাধনা থাকিলে হইবে সিদ্ধি
বিধি মিলাইবে পুরস্কার ।"

আমাদের কাছে পার্থসারথি তো সাধনার পথিকৃৎ।

শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রয়াণের পর পার্থসারথির ছাপা খরচ কয়েকবার বেড়েছে। প্রায় প্রতিমাসেই একটু একটু করে। এবার নিউজপ্রিন্টের দাম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার যে কি ক্ষতি হয়ে গেলো তা বোঝাতে পারব না। যেদিন সংবাদপত্রে খবরটি বেরোল আগেই চিন্তা হল বিরাজবাবু, রথীনবাবু এই কাগজটি পড়েন কি? না পড়লে তো দাম বাড়াবার কথা জানতে পারবেন না। যেন আমার পাঠ্য সংবাদপত্রটিই পৃথিবীর একমাত্র সংবাদপত্র।

পার্থসারথির যাঁরা গ্রাহক করেন তাদের মধ্যে গীতাদির শৃঙ্খলা শেখবার মতো। ওর খাতায় লেখা থাকে ওর নিজের করা গ্রাহকদের তালিকা। তাই

DO NOT COPY

প্রতিবার বিশাল খাতা ঘেঁটে ঘেঁটে আমাকে ওর গ্রাহকদের নাম বারবার খুঁজতে হয় না। এতে আমারও সময় বাঁচে অনেক, চিন্তাও কমে। তবে সবাই তো গীতাদি নয়। তাই এক একজনের জন্য বারবার গ্রাহক তালিকা তৈরি করে দিতে দিতে এবং ধন্য হতে হতে ক্লান্তি এসে যায়। রুজিরোজগার, সংসার তো আছেই।

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমি মোটামুটি সবার কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। এই প্রসঙ্গে কিছু লেখার আগে আমি অনেক দূরের কয়েকজন লেখক ও পাঠকের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। এরমধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের যিনি নিয়মিত লেখা পাঠান, নিয়মিত চিঠিপত্র দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেন। দ্বিতীয় জন কারমাটারের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ পি.সি. মুখার্জী। তিনি কারমাটার দুমকা দেওঘর ইত্যাদি স্থানের গ্রাহক করে দিয়েছেন। সব টাকা সংগ্রহ করে একসাথে টাকা M.O. করে পাঠিয়ে দেন সময়মতো। দরকারমত চিঠি দিয়ে থাকেন।

তৃতীয় ব্যক্তি হলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ গুঁই। ইদানীং বরানগরে বেশী থাকেন না। সেই কুলটিতে বেশীরভাগ সময় কাটান। এর মধ্যে লেখা পাঠান, গ্রাহকের টাকা এখানে এসে জমা দিয়ে যান। বয়স হয়েছে, কিন্তু উৎসাহ অফুরন্ত। শ্রীপ্রীতিকুমারের সঙ্গে তাঁর গভীর সৌহার্দ্য ছিল। সে কথা এখনও ভোলেন নি।

আর আছেন ভাজনদা। প্রত্যেক বছরে পুরাতন গ্রাহকদের সাথে ঠিক একটি নূতন গ্রাহক করে আনেন। সঙ্গে আছে তাঁর ছেলে অপু। তাঁর জামাই শ্রীপঙ্কজ বাবাজীবন তো advertisement form সেই সুদূর বোম্বে থেকে ছাপিয়ে পাঠালো। হয়ত সবার নাম মনে করে লিখতে পারিনি। যাঁরা নিতান্ত বাদ চলে গেলেন, তাঁরা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন – নিজগুণে।

যিনি এক হাজার টাকা দেন তাঁর নাম যেমন আমার কাছে উল্লেখযোগ্য, তেমনই নিজের সামর্থ্য অনুসারে যিনি এক টাকা দেন, তার দামও আমার কাছে একই ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। ফলে যাঁরা ঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন না, তাঁরা ভাবেন পার্থসারথিতে কত জনেই না কত টাকা দিচ্ছেন! সুতরাং না জানি কি স্বচ্ছলতা!

শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতে এমন ঘটনা ঘটেনি। তিনি সময় মত পার্থসারথি প্রকাশ করেছেন। তখন সবাই তাঁকে টাকা দিয়ে ধন্য হতেন। আজতো আর ধন্য হবার সম্ভাবনা নেই। বিপদে না পড়লে কে আর তাঁকে মানছে? এই আড়াই বছরে দেখে দেখে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও অনেক বেড়েছে। আমি শ্রীপ্রীতিকুমারের মত পার্থসারথির জন্য ভিক্ষা করতে পারব না। তিনি পত্রিকা প্রকাশের জন্য দৈব নির্দেশ পেয়েছিলেন। আমি যা করছি তা আমার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়। যতদিন পারব করব, কিন্তু তার জন্য বারবার তো হাত পাততে পারব না। যদি কেউ সাহায্যের হাত না বাড়ান, যে কটি গ্রাহক টাকা পাঠান, শুধু সেই কটি সংখ্যা ছাপাব। এখনও পর্যন্ত শ্রীপ্রীতিকুমারের ইচ্ছানুযায়ী সারা ভারতবর্ষের বহু আশ্রম, প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী ও আত্মীয় স্বজনের কাছে free পাঠান হয়। জানিনা এ ব্যবস্থা বজায় রাখা আর সম্ভব হবে কিনা। মনে হয় আমি আর পেরে উঠব না। শ্রীপ্রীতিকুমারের যে resource ছিল, সেটা আমাদের নেই।

পাঠকবর্গ ভাবতে পারেন এত কথা কেন লিখি! আসলে কোথাও যেন সূক্ষ্ম বেদনার প্রভাব পড়ে। একটি লোক থাকতে কি ছিল আর না থাকতে কি অবস্থা হচ্ছে।

আমাকে নিয়মিত লিখতে হয়। বেশীরভাগ পাঠক আমাকে সাক্ষাতে চিঠিতে ব্যক্তিগত জীবনটিকে তুলে ধরতে উৎসাহিত করেন। তাই আমি লিখে যাচ্ছি। তাঁর কথা লিখতে গেলে স্বাভাবিক ভাবে আমার কথা এসে পড়ে। আমার লেখার মধ্যে হয়ত বিদ্রোহের সুর ধরা পড়ে - সেটা তাঁদের কাছেই যারা এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আমি তো মোটামুটি ঘটনাগুলি তুলে ধরি, প্রাসঙ্গিক কোনও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিনা। যিনি জড়িত তিনিই একমাত্র বুঝতে পারবেন কেন আমার এই দুঃখবোধ, অপমানবোধ। যদি কেউ আমাকে শ্রীপ্রীতিকুমারের পাশে রেখে বিচার করেন তাহলে ভুল করবেন। আমার সঙ্গে তাঁর আকাশ পাতাল তফাৎ। আমি একজন অতি সাধারণ মহিলা। সুখ-দুঃখ, আনন্দ উচ্ছ্বাস, বিরক্তি, শোক, রাগ, সবই আমার মধ্যে বর্তমান। শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে কখনও অসাধারণত্বে পৌঁছতে বলেন নি। আমার এই সহজ স্বাভাবিক ভাবটিকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কাউকে স্পষ্ট কথা বলে এসে তাঁর কাছে যখন জানতে

চেয়েছি- "এটা কি ঠিক বলেছি?" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছেন, "বেশ করেছ। সত্য কথাই বলতে হয়। ভয় করবে কেন?"

আমার কিছু লিখতে ব্যক্তিগত ঘটনাগুলিই এসে পড়ে। কখনও কখনও কারও কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। আসলে জীবনটা তো রুটিনমাফিক চলত না, বৈচিত্র্যে ভরা ছিল। সেই বৈচিত্র্যময় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন নানাজন। স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে তাঁদের আবির্ভাব স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। কেউ কেউ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু আমার তো কিছু করবার নেই।

সবশেষে একটা কথা বলতে চাই - আমরা যে অবস্থায় পার্থসারথি প্রকাশ করে চলেছি তার সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। শ্রীপ্রীতিকুমার খুব গর্ব করে বলতেন, "এই পত্রিকা প্রকাশ হতে একটুও দেরি হয় না, সকলে বলেন খুব নিয়মিত।" আমরাও সেটা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। এর জন্য আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় ব্যয় সংক্ষেপ করতে হয়। তবু আমরা এগিয়ে চলবার চেষ্টা করছি শ্রীপ্রীতিকুমারের অগণিত ভক্ত প্রিয়জনের সহায়তায়।

ত্রুটি আমার অনে.....ক। কিন্তু সব ঘটনাগুলি যখন মনে পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই লিখে ফেলি। কারও ভাল লাগে, কারও লাগেনা। যাদের ভাল লাগেনা, তাদের কাছে আমি সত্য প্রকাশের জন্য দুঃখ স্বীকার করছি। আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই পার্থসারথির জন্মদিনে।

– – – – – – – – –
(** রচনাকাল - জুন, ১৯৮৯)

স্বাধীন তুমি **শ্রীমা**

স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ বলত? যা তোমার ভাল লাগে তাই তুমি ইচ্ছামত করে বেড়াবে- এই কি স্বাধীনতা? কিন্তু, তুমি কি জান তোমার এই "তুমি" বস্তুটি কী? তুমি কি জান তোমার নিজস্ব ইচ্ছা কী? তুমি কি জান কোন চিন্তাটি তোমার অন্তর থেকে আসছে আর কী কী আসছে বাইরের জগত থেকে? তোমার যদি নিজস্ব দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকে তাহলে তোমার সঙ্কল্প অনুযায়ী

তুমি কাজ করতে পার। কিন্তু তা যদি না থাকে? সাধারণতঃ তোমার সাময়িক আবেগই তোমায় চালিত করে। আবার সব আবেগই তোমার নিজস্ব আবেগ নয়। কতশত আবেগ বা প্রেরণা বাহিরের থেকে এসে তোমাকে দিয়ে সর্বরকমের বোকামির কাজ করিয়ে নেয়। তখন তুমি রাক্ষস বা পিশাচের কবলে পতিত হও। তারা তোমাকে প্রথমতঃ আহাম্মকের মত কাজ করায়, পরে তোমার দুর্গতি দেখে হাসতে থাকে।

যদি তোমার ইচ্ছাশক্তি বলবতী হয়, যদি তোমার সঙ্কল্প, আবেগ, প্রেরণা এবং আর সবই কেন্দ্রিত হয় চৈত্য সত্তার চৌদিকে, তাহলে ঐরূপ পরিস্থিতিতেই তুমি পেতে পার মুক্তি ও স্বাধীনতার আস্বাদন, অন্যথায় তুমি একটি ক্রীতদাস মাত্র।

---

* * (শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে)

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা **শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীশ্রীমায়ের একটি বাণী হচ্ছে (১৫.০৮.১৯৭২)- "Lord, we are upon earth to accomplish Thy work of transfor-mation. It is over sole will, sole occupation." -"ভগবান তোমার রূপান্তরের কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্যেই আমরা পৃথিবীতে রয়েছি। তাই আমাদের একমাত্র সংকল্প, একমাত্র প্রবৃত্তি"- শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনার মূল কথা এইখানে - এই সাধনা নিজেদের ব্যক্তিগত মুক্তি বা নির্বাণের দিশা দেয় না- কিন্তু শিক্ষা দেয়, দীক্ষা দেয়, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়- "To be in full union with the Divine is the final aim. When one has some kind of constant union, one can be called a Yogi, but the union has to be made complete. There are Yogis who have only the union on spiritual plane, others who are united in mind and heart; others in the vital also. In our Yoga our aim is to be united in the physical consciousness and on the supramental plane. (On Yoga II Tome one P. 483)

এর ভাবার্থ হচ্ছে যে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন সব যোগেরই উদ্দেশ্য যুক্ত হওয়া সেই পরম ও চরমের সঙ্গে, কিন্তু সেই যোগ যাতে সম্পূর্ণ হয় শুধু কায়েন মনসা বাচা নয়, শুধু জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির মাধ্যমে নয় –সব কিছু দিয়ে, সবকিছু নিয়ে একেবারে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া শুধু আধ্যাত্মিক স্তরে (Spiritual plane) নয়, শুধু চিত্ত নিতি নৃত্যে বা মনের গভীরে গহ্বরে মশগুল হয়ে থাকা নয়, শুধু জৈবজীবনেও যেন প্রতিনিয়ত নিত্য-রাস হচ্ছে তাও নয়, সে সব তো আছেই- আমাদের যোগ হচ্ছে তার সঙ্গে সাধারণ জৈবিক জীবনেও যেন তিনিই ধ্যান জ্ঞান মনন নিদিধ্যাসন আবার মননের স্তর পেরিয়ে অধিমানসে অতিমানসেও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পাবো। এর মানসাঙ্ক হচ্ছে ০-০=০ অর্থাৎ শূন্য থেকে শূন্য বাদ দিলে যেমন শূন্যই থাকে তেমনি পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই থাকা-- পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। কিছুই 'নেতি' নয় সবই ইতি বাচক।

সেইজন্য সেই পরম দিব্যের তিনরূপঃ

তিনি-(১) সর্বভূতান্তরাত্মা (Cosmic self and spirat that is behind all things) যাকে আমরা বুঝিনা শুধু অজ্ঞানতার ক্রিয়ায় অচেতনতার বশে।

(২) তিনিই আমাদের জীবনের ক্রান্তি-লগ্নের পুরুষোত্তম, "হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি" অন্তর্যামী পুরুষ-Ghostic Being.

(৩) আবার তিনিই সর্বব্যাপী, সর্বত্র, বিশ্বগ, বিশ্বাতীত, সত্য, শিব, সুন্দর-Transcendental Being-তাঁর স্পর্শে আলোকের ঝরণা ধারা ধুইয়ে দেয় আমাদের কালোর সব মালিন্য, নিয়ে আসে আলোর বন্যা আর আমরা দেখি-সেই তিনকে-The Transcendental, the Cosmic, the Individual- সেই আনন্দময়কে, প্রেমময় শক্তিময়কে-God the father, God the son, God the Holy ghost কে-

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ।

পাতঞ্জল দর্শনে সেই পুরুষকে বলা হয়েছে "ক্লেশ কর্মবিশাকাশৈর পবামৃষ্ঠঃ (ঈশ্বরঃ)", সাংখ্যকারিকায় আছে "পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং"। যোগদর্শনে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ব স্বীকৃত। গীতাতেও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় পঞ্চমহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চ তন্মাত্র, ও অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, স্মৃতি (গীতা ১৩।৬-৭) প্রভৃতির উল্লেখ পাই। সব পেরিয়ে আসেন যিনি উত্তম পুরুষ।

শ্রীঅরবিন্দ যোগেও এগুলি অবান্তর নয়, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন করে দিচ্ছেন, তিনি কোন নূতন ধর্মপ্রণালী বা সাধনার ক্রমও ব্যক্ত করেন নি এবং তাঁর দর্শনও বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে তাঁর নিজের বহুবিস্তৃত উপলব্ধিকে ছড়িয়ে দিয়েছে আমাদের মধ্যে এবং তাছাড়া তাঁর সাধনায় শুধু হিন্দু বৌদ্ধ জৈন কেন, ইসলাম খ্রীষ্টধর্ম ব্যাখ্যাত কোন সাধনপ্রণালীকে হীন তো করেইনি বরং উচ্চে তুলে ধরেছে। তাঁর বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদকে আরও এগিয়ে দিয়েছে- শুধু Intuitive awareness নয়- যে দিব্য আমার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে involved তারই evolution তার কাম্য- The animal is living laboratory in which nature, it is said, worked out man. Man himself may well be a thinking and living laboratory in whom and with whose conscious co-operation. She wants to work out the superman- এই বিবর্তনের চেতনা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে চিন্তা। এর মধ্যে আছে আরোহণ ও অবরোহণ- (ascent ও descent)। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির কথা আমরা সবাই জানি।- কালী আর ব্রহ্মের উপমা দিয়েছিলেন পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কালী কাকে বলি-কালং কলোতি যা সা- কাল অর্থাৎ Time space continuum-এর ঊর্ধে যে শক্তি ক্রিয়াশীলা তিনিই কালী- মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা। সেই আদ্যাকেই আমরা "বৃণুতে"। চণ্ডীতে তাই পড়ি-

দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
তমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য
আধারভুতা জগতস্তমেকা
মহীস্বরূপেন যতঃস্থিতাসি।

যুগে যুগে মহাপুরুষরা আসেন, যখনই 'ধর্ম্মস্য গ্লানির' সংঘটন হয়, অবতারকল্প পুরুষরা দেখা দেন, মোড় ঘুরে যায়- তবে কদিনের জন্য-রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি, মাথা করো নত
এ আমার, এ তোমার পাপ
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জমি বায়ু কোণে আজিকে ঘনায়

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ
জাতি অভিমান –

এ জগৎ অসত্য নয়, লীলাও নয়, নির্বিশেষে ও সবিশেষে ভগবদ-সত্তারই প্রকাশ। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বললেন-তাঁর সাধনা এই সত্যকেই বিকাশ করে।

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাকেই নবভাবে রূপায়িত করে ভারতীয় চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফলটিকে জনগণমনে নিমগ্ন করতে চেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন- শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হতেই সত্যযুগের সূচনা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের বাল্য ও কৈশোর জীবনের কথা পূর্বেই বলেছি। ১৮৯৩ সাল জাতির ইতিহাসে এক বিচিত্র ঘটনা বহুল সময় সংকেত। পূব থেকে পশ্চিমে চলেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির জ্ঞানের, আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ নিয়ে একজন জগজ্জয়ী সন্ন্যাসী আর ওখান থেকে প্রতীচ্যের জ্ঞান, বিদ্যা, মানবিকতার বারতা নিয়ে আসছেন ভারতবর্ষে আর একজন ২২ বছরের তরুণ- শ্রীঅরবিন্দ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে শ্রীঅরবিন্দকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করেছিলেন তার বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিচ্ছি- ধর্ম পত্রিকা ১৯০৮ ১৮শ সংখ্যা- পৌষ ১৯-শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যত ভারত (Sri Aurobinda centenary library Edition vol IV, p.439)- ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ও তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তিকা রচিত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে তিনি দেশে যে নতুনভাব গঠিত হইয়াছে, যে ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে যে ভাবতরঙ্গে মত্ত হইয়া কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে সে ভাবের কথা কিছুই বলেন নাই, সর্বভূতান্তর্যামী ভগবান তাহা দেখেন নাই- একথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? যাঁহার পাদস্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগ-সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে শক্তির সামান্য মাত্র উন্মেষে দিগদিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে; যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম প্রবর্তক, অতীত অবতারগণের সমষ্টি স্বরূপ তিনি ভবিষ্যত ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না- আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যত ভারত প্রতিনিধিকে আপন সন্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন।

এই ভবিষ্যত ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। লোকগুরু তাঁহাকে যে ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না। তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীর সাধক ভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাকে বলিতেন-"তুই যে বীর রে"। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া যাইতেছেন কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্য করজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীর ভাব সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎবাণী স্মরণ রাখিতে হইবে "তুই যে বীর রে"।

এই বীরভাবেই সাধনা শ্রীঅরবিন্দের সাধনা - এ হচ্ছে পূর্ণ সাধনা, জগৎকে, দেশকে, দেশের পরাধীনতাকে বাদ দিয়ে নয়-

মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসন্মান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলেস্থলে বেড়ায় ফিরিয়া
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাপার
নূতন বিজয় ধ্বজা তুলে।

শ্রীঅরবিন্দ সেই ধ্বজাই তুলে ধরেছিলেন- পূর্ণ জীবনের, পূর্ণ যোগের, পূর্ণ সাধনার ধ্বজা- তাই তাঁর কম্বুকন্ঠে শুনি- Do not worry about mistakes in work, often you imagine that things are badly done by you when really you have done them very well, but even if there are mistakes it is nothing to be sad about. Let the consciousness grow-only in the Divine consciousness (p.683 on Yoga II Tome one).

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মূল কথা আমরা পাই তাঁর লেখার সর্বত্র, তাঁর কর্মে ও তাঁর ভাবগম্ভীর জীবনের পরিমণ্ডলে। তিনি তো শুধু দার্শনিক নন, তিনি দ্রষ্টা ঋষি। তিনি মননের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন যে সত্য, তাকেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন জীবনের প্রতি স্তরে যা স্বাদু হয়েছে তাঁর কাছে পদে পদে।। Life Divine vol.I তাই আরম্ভই হয়েছে দুটি নেতিবাদকে নস্যাৎ করে- The Materialist Denial, The Refusal of the Ascetic আর তার মূলই হচ্ছে মানব জীবনের আস্পৃহা- The Human Aspiration. এই রূপরস ঐশ্বর্যময়ী

পৃথ্বীর ডাক তিনি শুনেছেন- কারণ আসলে সব মাটিই যে সোনা-সবই যে ঈশ্বর- ঈশাবাস্যমিদংসর্বং - এই পৃথিবী তো তাঁরই পাদভ্যাম পৃথ্বী (মুণ্ডক উপনিষদ ২,১,৪) বা পৃথ্বী পা যস্যম্ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১,১,১)। সেইজন্য এই পৃথিবীকে বর্জন করবার কথা ওঠেই না। তাকে তপস্যার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিষ্ঠার দ্বারা বদলে নিতে হয়, নয় শুধু তার ভিতর যে ঘনীভূত রস ও শক্তি অবস্থান করছে, তাকে শুধু স্বীকার করা নয় তাকে দেবত্বের বিভূতিতে পরিণত করে, রূপান্তরিত করে একাত্ম হওয়া। কিন্তু এখনই প্রশ্ন উঠবে-আজ বিজ্ঞানের দিন- বিষয়কে জানতে হবে তাহলে? সবেরই মধ্যে দেবত্বের বিভূতি যদি থাকে? কিন্তু এখানে জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়ের প্রভেদ যাবে মিলিয়ে- ভাবে জানি আপনাকেই, আত্মাকেই বিষয়টা উপলক্ষ্য
রূপে সেই আপনার সঙ্গেই মিলিত। মানুষ যখন আপনার মধ্যে সেই সত্যকার মনের মানুষকে দেখে Divineকেই দেখে তখন তার সার্থকতা তার আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক তাতে কিছু আসে যায় না। সে লীলায় সুন্দরও আছে, অসুন্দরও আছে, সুখ আছে, দুঃখও আছে, অনাসক্তি আছে, আসক্তিও আছে- রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের কথা লিখেছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী সাহিত্যের পথে বইটি যখন উৎসর্গ করেন। এই কথাগুলিই যদি সাহিত্যিক জগতের বিশ্লেষণ থেকে আধ্যাত্মিক জগতে মানস বিচারে নিয়ে যাই, দেখি যে বিবেকানন্দের কথায়-

'মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে কালনৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তার কাছে আসে'

মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনার শবমুন্ডী আসনে বসে শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।
তাই কবি গায়-

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান ঝনন্ রনন্
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অস্তমিত হউক কম্পিত সুগভীর স্বনন্
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদাত্ত জয় ভেরি করহ আহ্বান
আমরা দাঁড়াব উঠি আমরা ছুটিয়া বাহিরিব অর্পিব পরাণ
চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন হেরিব না দিক
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার উদ্দাম পথিক
মুহূর্তে কবির পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা উপকন্ঠ ভরি
খিন্নশীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কারলাঞ্ছনা উৎসর্জন করি ...

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ আর এক জায়গায় বলছেন–

What was Ramkrishna? God manifested in a human being, but behind there is God in his infinite personality. And what was Vivekananda? A radiant glance form the eye of Shiva; but behind him is the divine gaze from which he came and Shiva himself and Brahma and Vishnu and Om all exceeding.

তাই শ্রীঅরবিন্দের সাধনা শুধু Being to Becoming নয়, উন্মুখী ভক্তের মদীয়া রতি বা লীলাপিয়াসীর তদীয়া রতি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নয়, এ সব ত আছেই, তার সাধনা ও সিদ্ধি ব্যক্তিগত নয়, মানব জাতির জন্য– অবশ্য একথা সত্য যে ব্যক্তিগত সাধনায় পূত না হলে মানব জাতির চৈতন্য ও জীবনধারায় একটা আমূল পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না। এই যে বিবর্তন ধারা– প্রকৃতির ক্রম প্রগতির প্রবণতা– যিনি আমার গুহায়িত হৃদ্দেশে তিনি পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হতে চাইছেন–সব দিকে– সব স্তরে– দেহে, মনে, অন্তরে– প্রাণময় সত্তা থেকে সর্বচৈতন্যময় জগতে– আধ্যাত্মিক বিবর্তন একেই বলি। ক্রম প্রগতির ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মানবজাতির মধ্যে তার সমবেত চেতনার মাধ্যমে একটা প্রয়াস চলেছে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক একটা নূতনতর জীবনে উত্তীর্ণ হতে – বিজ্ঞান, দর্শন, অধ্যাত্ম বিদ্যা সবই মানুষকে, তার Human Aspiration কে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। শ্রীঅরবিন্দ বললেন–এই তো এক একটি দিব্যের মন্দিরে যাবার সোপান–এগিয়ে চল– চরৈবেতি। অথচ জীব এক হিসাবে শিব হলেও দুর্বলতায় অজ্ঞানের আধার (Inconscient) কিন্তু আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে সে সর্বশক্তিমান, চিন্ময়, পরম ভাগবত–মানুষের একদিকে কবির ভাষায়– আমার আমি– অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃত ভাব– নিম্নতম প্রান্ত, আর এক দিকে ঊর্ধতম আস্পৃহা– আমিই সেই সোঽহং–হংস–পরিশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত প্রকৃতি, ভাগবতী শক্তির কেন্দ্র ওং যন্ত্র।

শ্রীঅরবিন্দ স্থূল জড়বাদী বৈজ্ঞানিক নন্ আবার মায়াবাদী কুহেলিকাতেও আবদ্ধ নন। তাঁর সাধনা তাই সব নিয়ে–চিরকল্যাণের পথে অনুগত হওয়া– অচঞ্চল অপ্রগলভ স্তব্ধতার মধ্যেও। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শেষ করি এই অধ্যায়ঃ–

আমার গুরুর পায়ের তলে
শুধুই কিরে মাণিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটায়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলারে

আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে?
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন
তাই তো আমি তার চেলা রে।

বুদ্ধ কথা **শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়**

বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতমাতার কোলে বিভিন্ন যুগে কয়েকজন মহামানব ও ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা তাদের জীবন দিয়ে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, যা হাজার হাজার বছর ধরে দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে অসংখ্য মানুষকে সত্য, জ্ঞান ও ধর্মের পথ দেখিয়েছে।

এরকম একজন মহামানব হলেন ভগবান বুদ্ধ। বুদ্ধদেবের কথা বলতে গিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি।' এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব জন্মগ্রহণ করেছিলেন আড়াই হাজারেরও কিছু বেশী বছর আগে হিমালয়ের কোলে শাক্যরাজার রাজধানী কপিলাবস্তুতে। তখন সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। তাঁর রাণীর নাম মায়া দেবী। রাজার ঐশ্বর্য ছিল প্রচুর। তাঁর রাজ্যে প্রজারাও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতেন। কিন্তু রাজা ও রাণীর মনে আনন্দ ছিল না; কারণ, তাঁদের কোন সন্তান হয়নি। তাঁদের যাতে একটি পুত্র সন্তান হয়, সেজন্য তাঁরা অনেক দানধ্যান করতেন।

একদিন শেষ রাত্রে মায়া দেবী স্বপ্ন দেখলেন একটি ছোট সাদা হাতী হিমালয় পর্বতের ওপরের মেঘের ভেতর থেকে ওর কোলে নেমে এল। তিনি হাতীটিকে যেই ধরতে গেলেন, তখনই হাতীটি মিলিয়ে গেল। তাকে ধরা গেল না। তাঁর এই স্বপ্ন দেখার বছর খানেক পরে বৈশাখ মাসের এক পূর্ণিমার রাত্রে তাঁর কোলে জগৎ-আলো করা রূপ নিয়ে একটি ফুটফুটে ছেলে জন্মগ্রহণ করল। শুদ্ধোদনের মনের বাসনা সিদ্ধ হল। তাই তিনি ছেলের নাম দিলেন সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের জন্মের কয়েকদিন পরেই তাঁর মা ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁকে লালন পালন করেন তাঁর বিমাতা গৌতমী। তাই সিদ্ধার্থর আর এক নাম হল গৌতম। ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ ছিলেন ধর্ম ভাবাপন্ন। তিনি যদিও রাজকুমার ছিলেন, কিন্তু রাজকুমারের মত খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ, মৃগয়া ইত্যাদিতে তিনি আনন্দ

পেতেন না। তাঁর এই ভাব দেখে রাজার মনে ভয় হত।

সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। তাঁর বয়স যখন ষোল বছর হল, তখন রাজা তাঁর বিবাহ দিলেন। যশোধরা বা গোপা নামে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে। রাজা ভাবলেন এরপর বোধ হয় সংসারের দিকে সিদ্ধার্থর মন বসবে। কিন্তু সিদ্ধার্থের মনের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সংসারের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য রয়েই গেল। বরং ক্রমশঃ দেখা গেল যে রাজবাড়ীর আরাম বিলাস তাঁর আরও খারাপ লাগছে। তিনি বাইরের জগতে আসার জন্য, বাইরের জগৎ সংসারকে দেখার জন্য ব্যাকুল হতে লাগলেন। অনেক কষ্টে পিতার অনুমতি নিয়ে একদিন তিনি রথে চড়ে রাজবাড়ী থেকে পথে বেরোলেন। প্রথম দিন বেরিয়ে তিনি একজন বৃদ্ধকে লাঠিতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে পথ চলতে দেখলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি দেখলেন রাস্তার ধারে এক রোগগ্রস্ত মুমূর্ষুকে রোগ যন্ত্রনায় ছটফট্ করতে। তৃতীয় দিন দেখলেন এক মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। তিনদিন এইসব দেখে তিনি গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মানুষ কেন রোগে কষ্ট পায়, কেন বার্ধক্যে জরায় কষ্ট পায়, মানুষের মৃত্যু হয় কেন – এইসব প্রশ্ন তাঁর মনে তোলপাড় করতে থাকে; আর তিনি ভাবতে থাকেন এসব দূর করার বা এগুলি থেকে মুক্তিলাভের কি উপায়? আর একদিন বাইরে বেরিয়ে তিনি গেরুয়াপরা এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন। সন্ন্যাসী কোন দিকে না তাকিয়ে ঈশ্বরের নাম করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে সিদ্ধার্থর মনে হল দুঃখ-ভরা এই পৃথিবীতে উনিই বোধ হয় ঠিক পথ ধরেছেন। কিছু চিন্তা করার পর তিনি মনে মনে ঠিক করলেন সংসারের মায়া কাটিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হবেন। তাহলে তিনি মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ ও তার থেকে মুক্তির উপায় জানতে পারবেন এবং তিনি এই সবের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারবেন।

সিদ্ধার্থের বয়স যখন ঊনত্রিশ বছর, তখন তাঁর একটি পুত্র সন্তান লাভ হয়। তিনি তার নাম দেন রাহুল। কিছুদিন পরে তিনি ভাবলেন যে তিনি সংসারের মায়ায় জড়িয়ে পড়ছেন। এ' তো তিনি চাননি। আষাঢ় মাসের এক পূর্ণিমার গভীর রাত্রে তিনি বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র সবাইকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। পায়ে হেঁটে পথ চলে চলে তিনি প্রথমে যান বৈশালী নগরে, তারপর বিন্ধ্যাচলে, তারপর রাজগৃহে। তিনি সন্ন্যাসী পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্র পাঠ করলেন, ধ্যান করলেন, মন্ত্রতন্ত্র অনেক কিছু শিখলেন – কিন্তু মুক্তির কোন উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না। আবার চলতে চলতে অবশেষে তিনি গয়ার

কাছে উরুবিল্ব নামে এক জায়গায় নিরঞ্জনা নদীর ধারে পৌঁছে সেখানে এক বট গাছের নীচে গভীর তপস্যায় মগ্ন হলেন। দিনে দিনে তাঁর দেহ শীর্ণ এবং দুর্বল হতে থাকল। তিনি উপলব্ধি করলেন যে কেবল নিজেকে কষ্ট দিয়ে কঠোর তপস্যা করলেই দিব্যজ্ঞান লাভ করা যাবে না; কারণ শরীর যদি সুস্থ ও স্থির না থাকে, তাহলে মানসিক একাগ্রতা আসবে না। এইভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে।

একদিন তিনি নদীর জলে স্নান করে বোধগয়ায় একটি বিশাল অশ্বত্থ গাছের নীচে ধ্যানে বসলেন। সেদিনটি ছিল বৈশাখ মাসের প্রথম পূর্ণিমা। পৃথিবীর দুঃখের কারণ ও তার শেষ কোথায় তিনি জানবেনই – এই দৃঢ় সঙ্কল্প মনে নিয়ে তিনি ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। সেইদিনই শেষ রাত্রে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। এই দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি হলেন 'বুদ্ধ'। 'বুদ্ধ' কথাটির অর্থ হল জ্ঞানী, তথাগত – অর্থাৎ যিনি পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। যে অশ্বত্থ গাছটির নীচে তিনি ধ্যানে বসে এই জ্ঞান লাভ করেন, সেটির নাম হল– 'বোধিদ্রুম' এবং স্থানটির নাম হল 'বুদ্ধগয়া' বা বোধগয়া।

বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি সারনাথে যান। সেখানেই তিনি প্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেন। তিনি বলেছেন যে অবিদ্যা বা না জানাই হল পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের মূল। অবিদ্যা দূর হলে বা জানা হলে দুঃখকে আর দুঃখ বলে মনে হবে না। মানুষের সুখ বা দুঃখ সব মিথ্যা। মৃত্যু জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পরেও জীবন আছে – কারণ, কামনা বাসনা ও মিথ্যা মোহের জন্য মানুষ পৃথিবীতে বার বার জন্মগ্রহণ করে এবং সে দুঃখকে এড়াতে পারে না। তাই তিনি বলেন যে মোহমায়া কাটিয়ে মানুষকে 'মহা–পরিনির্বাণ' লাভ করতে হবে। তাই হল মানুষের মুক্তির উপায়।

সারনাথে বাণী প্রচারের পর অনেক লোক তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চাইলে বুদ্ধ তাঁদের দীক্ষা দেন। সারনাথ থেকে তিনি যান অযোধ্যায়। তারপর অযোধ্যা থেকে মগধ। দীর্ঘ ৪৫ বছর তিনি বিহার ও অযোধ্যায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বীদের মধ্যে একতা স্থাপনের জন্য তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ স্থাপনা করতে থাকেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম হল 'বৌদ্ধধর্ম', আর যাঁরা সেই ধর্মে দীক্ষিত হলেন তাঁরা হলেন 'বৌদ্ধ'। মগধের রাজা বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হল–হিংসা, দ্বেষ, রক্তপাত মিথ্যা, এবং সত্য হল– অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রী।

আশি বছর বয়সে বুদ্ধ কুশীনগরে তাঁর এক শিষ্যের গৃহে এক বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মহা-পরিনির্বাণ লাভ করেন অর্থাৎ দেহত্যাগ করেন।

তাঁর মহা-পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর প্রচারিত ধর্ম তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, জাভা, সিংহল প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দেশে প্রচার লাভ করে। এই সব দেশের অসংখ্য মানুষ ভক্তিপূর্ণ চিত্তে এই প্রার্থনা সঙ্গীতটি করেন- 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

বুদ্ধদেবের সময় এবং তাঁর মহাপরিনির্বাণ লাভের পর ভারতবর্ষে চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, আয়ুর্বেদ ও রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল।, যার নিদর্শন আজও ভারতবর্ষের দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে।

বুদ্ধদেবকে বাস্তববাদী ধর্মপ্রবর্তক বলা হয়। তাঁর ধর্ম গ্রহণের জন্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া একান্ত প্রয়োজন নয়। সংসারে বাস করেও তাঁর ধর্মগ্রহণ করা সম্ভব। তাঁর ধর্মগ্রহণকারীদের জন্য আটটি রীতির উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ দৃষ্টি, সৎ শ্রম, সৎ-মনোবৃত্তি, সৎ-ব্যবহার, সৎ জীবন ও সৎ আদর্শ। তিনি বলেছেন-এই আটটি রীতি জীবনে মেনে চললে মানুষ আত্মার উন্নতি সাধন করতে পারবে এবং ক্রমে ক্রমে শান্তি বা নির্বাণ লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে।

বুদ্ধদেব নিজে কোন ধর্মগ্রন্থ লিখে যান নি। তিনি মুখেই জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতেন। তাঁর দেহত্যাগের পরে তাঁর শিষ্যরা বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেন। এই শাস্ত্র গ্রন্থের নাম 'ত্রিপিটক'। পালি ভাষায় রচিত 'ধম্মপদ' গ্রন্থে বুদ্ধের অমর বাণীগুলি প্রকাশিত হয়েছে। 'ধম্মপদ' গ্রন্থটিকে বৌদ্ধ সাহিত্যের অত্যুজ্জল মণি বলা হয়।

মহৎ জীবনের অভয়বাণী প্রচারের জন্য এবং দুঃখকষ্ট, জরাব্যাধির হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য সঠিক পথ দেখানোর জন্যই বোধ হয় করুণাঘন ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীতে এসেছিলেন।

শিখগুরু অমরদাসের অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

শিখ সম্প্রদায়ের তৃতীয় গুরু হচ্ছেন অমরদাস। তাঁর গুরু হচ্ছেন দ্বিতীয় শিখগুরু অঙ্গদ। অমৃতসরের নিকট বসরকা গ্রাম। এই গ্রামে ভল্ল শ্রেণীর এক ক্ষত্রিয় কূলে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন অমরদাস। তাঁর পিতার নাম তেজভান্ আর মাতার নাম ভক্ত কাউর।

গভীর বনে কঠোর সাধন- ভজনে নিরত থাকেন অমরদাস। সঙ্গীরা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে, কখন অমর দাস এসে দাঁড়াবেন তাদের কাছে, তারা করবে তাঁর সেবাপরিচর্যা।

একদিন অমরদাস দেখলেন এক অলৌকিক ব্যাপার। তাঁর সামনে হাজির হয়েছে অল্প বয়স্ক এক মেষ পালক। তার অন্তরে ভক্তির আধিক্য রয়েছে। সে সঙ্গে করে এনেছে বনের কিছু ফুল আর মিষ্টি। সেগুলি সে নিবেদন করবে অমরদাসকে। জাতিতে সে মুসলমান। নাম তার বহলুল্। প্রতিদিন বহলুল্ গুরু অমরদাস এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্যে ফুলফল ও প্রচুর দুধ রেখে যায়। গুরু অমরদাস কঠোর জপতপের পর সেই সব গ্রহণ করেন এবং সঙ্গীদের ডেকে সেগুলি যথোচিত ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেন।

একবার গুরু অমরদাস তাঁর ভক্ত শিষ্যদের ডেকে বললেন, ঈশ্বরের লীলা বড় বিচিত্র। আমরা তো জনমানবশূন্য বনে রয়েছি। অথচ এখানে আমাদের কাছে দয়াময় ঈশ্বর পাঠিয়ে দিয়েছেন বহলুলের মত এক সুন্দর রত্ন।

ভক্তেরা গুরুর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলো। তারা ভাবলে, বহলুল তো একজন সামান্য মেষ পালক। তাকে গুরুজী এতোখানি গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? ভক্তেরা বিস্ময়ান্বিত চিত্তে তাকিয়ে রইলো গুরুজীর মুখের দিকে। তারা অপেক্ষা করতে লাগলো, গুরুজী বহলুল্ প্রসঙ্গে আর কি বলেন তাই শোনবার আশায়।

এবার গুরুজী বলতে শুরু করলেন, বহলুল্ হচ্ছে একজন পবিত্রমনা যুবক। ওর আধার বড় সাত্বিক। ও ঠিকমত জপতপ করলে শীগ্গির ঈশ্বরের কৃপা পাবে।

রোজকার মত সেদিন বহলুল্ কিছু দুধ ও ফুল নিয়ে এসে দাঁড়ালো গুরু অমরদাসের সামনে। গুরু অমরদাস বহলুলের মুখের দিকে তাকিয়ে পরম তৃপ্তি ভরে বলতে লাগলেন, বৎস বহলুল্, আমি তোমার সেবাপরিচর্যায় বড় প্রীতিলাভ করেছি। এবার তোমার মনের কি বাসনা তা বলো। তুমি কি অর্থ

চাও? মান, যশ কিংবা সেরকম আর কিছু? উত্তরে বহলুল্ অমরদাসজীকে সেলাম জানিয়ে বলতে লাগলো, আমি অতি অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়েছি। তাঁদের মৃত্যুতে কত কেঁদেছি। কিন্তু কৈ তাঁদের তো কান্নার মধ্যে ধরে রাখতে পারিনি। কেবল আমি কেন? আমি তো গরীব মানুষ। আমার কি ক্ষমতা আছে? অনেক বড়লোক টাকা খরচ করে জীবনকে ধরে রাখতে পারে না। জীবন তার হাত থেকে পালিয়ে যায়। এই তো সেদিন তিন খানা গাঁয়ের মালিক এক জমিদার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারা গেল। অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখলো, কিন্তু তাঁকে তো বাঁচাতে পারলো না।

দেখছি, এই দুনিয়াটা একটা খেলাঘর। এখানে কতরকম রং-তামাসা চলছে। তার আর শেষ নেই-সীমাও নেই। এই বিশ্বসংসারের বিচিত্র খেলার পেছনে একজন জগৎ খেলোয়াড় নিশ্চয়ই রয়েছেন। তাঁর নির্দেশে এইসব খেলা চলছে। আমি সেই জগৎ খেলোয়াড় - আসল মালিককে দেখতে চাই। তাঁর আশ্রয়ে থাকতে চাই। কারণ তিনিই এই বিশ্ব সংসারের একমাত্র সত্য। আর সব ভূয়ো। আমি তাঁর আশ্রয় পেতে চাই। আপনি দয়া করে আমাকে তাঁর আশ্রয় বলে দিন।

সামান্য মেষপালকের মুখ থেকে এমন সারগর্ভ ও সত্য কথা শোনার পর মুখখানা দিব্যানন্দে ভরে গেল গুরু অমরদাসের। তিনি তাঁর ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখো, প্রভুর কি বিচিত্র লীলা। নিরক্ষর, স্বল্পবুদ্ধি, সহায় সম্পদশূন্য একজন মেষ পালককে তিনি কি সুন্দর সদ্ ও সত্য বুদ্ধি দিয়েছেন। এই অল্প বয়সেই তার অন্তরে প্রভু দিয়েছেন চৈতন্যের বীজ। এবার সেই বীজ অঙ্কুরিত হবার সময় এসেছে। এই কথা বলে গুরু অমরদাস শান্তস্নিগ্ধ নয়নে একবার তাকালেন মেষ-পালক বহলুলের দিকে, বহলুলও তাকিয়ে রইলো গুরু অমরদাসের মুখের দিকে। দুজনের মধ্যে চলতে লাগলো দিব্য শক্তির লীলা। গুরু অমরদাস দৃষ্টিদানের মাধ্যমে মেষপালক বহলুলের অন্তরে দিব্যশক্তির সঞ্চার করলেন। তারপর ধীর কন্ঠে বহলুলকে কাছে ডেকে এনে বলতে লাগলেন, বৎস আমি তোমাকে নাম দেবো। সেই নাম জপ করবে। দেখবে তাতেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। তুমি যে মহান আশ্রয় চেয়েছিলে তাই পেয়ে যাবে। এই কথা বলার পর গুরু অমরদাস বহলুলের কানে শোনালেন তাঁর অভীষ্ট দেবতার বীজ মন্ত্র।

বহলুলও সেই মন্ত্র শোনার পর অনাস্বাদিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। তার সর্বাঙ্গে নেমে এলো দিব্যানন্দের প্লাবন। সে বারংবার গুরু অমরদাসের

শ্রীচরণে মাথা ঠেকাতে লাগলো। গুরুজীও তাকে আশীর্বাদ জানালেন। উত্তরকালে এই বহলুল হয়ে উঠলো ভারতের একজন নামী সাধক।

একবার গুরু অমরদাস ভক্তদের সঙ্গে এসেছেন পাঞ্জাবের কাসুরে। তখন গ্রীষ্মকাল। পাহাড়ী জায়গায় গরমের ভাগটা বেশী। তাই অমরদাসজীর ভক্তেরা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে সময় কাটাতে লাগলো। তাদের কন্ঠ ও তালু তীব্র পিপাসায় শুকিয়ে যেতে লাগলো। অন্তর্যামী গুরুজী জানতে পারলেন তাদের অপরিসীম কষ্টের কথা।

কিছুদূর যেতে যেতে তাদের সামনে পড়লো একটা ফুলবাগান। তার স্নিগ্ধ-শ্যামল আঙিনায় এসে বিশ্রাম নিতে লাগলেন গুরু অমরদাস তাঁর ভক্তদের সঙ্গে। অমরদাস ভাবলেন, এই বাগানে থেকে স্নানাহার সেরে নেবেন। রৌদ্র-তপ্ত দুপুরে সকলে এখানেই বিশ্রাম নেবে। তখুনি এক ভক্তকে তিনি পাঠালেন কর্তৃপক্ষের কাছে। নগরের শাসক হচ্ছেন পুরী শ্রেণীর ক্ষত্রিয়।

অমরদাসের নাম শুনে তিনি চটে উঠলেন। তাচ্ছিল্য ভরে বলতে লাগলেন আমি তোমাদের গুরুকে জানি। সে হচ্ছে ভাল্লা-শ্রেণীর ক্ষত্রিয়। এই তো সেদিনের কথা। বসরকা গ্রামে সে সাধারণ মানুষ হিসেবে বাস করতো। হঠাৎ দেখছি সে একজন মস্ত গুরু হয়ে গেল। চারদিকে তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আসলে সে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র সকলকে সে এক আসনে বসাচ্ছে। খাওয়াচ্ছেও। এভাবে সে উচ্চ বর্ণের জাত মারছে, তাদের সর্বনাশ করছে। এমন অনাচারী লোককে আমি কিন্তু আমার বাগিচায় জায়গা দিতে পারবো না।

ভক্তটি তখন ফিরে এসে গুরুজীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটি জানালেন। তাই শুনে গুরুজী কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকলেন। তারপর দৃঢ় কন্ঠে বললেন, ও সে এই কথা বলেছে! এতদূর স্পর্দ্ধা তার! বেশ, আমিও তাকে জানিয়ে রাখছি, এই জাতপাত শূন্য অনাচারী শিখরাই একদিন গড়ে তুলবে এক স্বাধীন রাজ্য। তার শাসক হবে একজন শিখ। আর কাসুর শহরকেও শাসন করবে একজন শিখ শাসক। যে আজ অহংকার বশে এই জাতিকে অপমান করলো সে তখন হবে শাসকের পরিচারক। পরবর্তীকালে গুরু অমরদাসের ভবিষ্যৎবাণী একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল।

একবার ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে গুরু অমরদাস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে চলে এলেন কাসুরের উপকন্ঠে এক গরীব পাঠানের বাড়ীতে। ঐ পাঠান অতিথিদের পরম আদর করে তার ঘরে বসালো। তারপর ঠাণ্ডা জল ও পাখার বাতাস

করে অতিথিদের আপ্যায়িত করলো। পরে বিনয় বচনে বলতে লাগলো, আমি একজন গরীব মানুষ। আপনাদের মত মেহমানদের সেবা করার মত ক্ষমতা আমার কোথায়? গুরু অমরদাস ঐ দরিদ্র পাঠানকে পরম আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে বলতে লাগলেন, ভাই, তোমার ঘরে যা সামান্য বস্তু আছে তাই আমাদের দাও। তাই খেয়ে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটবে।

এরপর গুরুজী ও তাঁর শিষ্যরা ঐ পাঠানের বাড়ীতে স্নান ও আহার করলেন। পরে বিদায় নেবার সময় গুরু অমরদাস বলতে লাগলেন, এমনিভাবে তুমি ভগবানের সৃষ্ট জীবের সেবা করে যাও। দেখবে, এতে করে তাঁর কৃপা অবশ্যই পাবে। অতি দ্রুত এই সমৃদ্ধ কাসুর নগরের তুমিই হবে শাসনকর্তা। এই বলে গুরু অমরদাস সেদিন সেই দরিদ্র পাঠানের কাছ থেকে বিদায় নেন।

দরিদ্র পাঠানও সেদিন গুরু অমরদাসের কথা ঠিক বুঝতে পারে নি। পরবর্তীকালে কিন্তু ফলে গেল সিদ্ধ সাধক অমরদাসের সেই ভবিষ্যৎ বাণী। সেই দরিদ্র পাঠানই একদিন হলেন ঐ নগরের শাসনকর্তা।

সেদিন গুরু অমরদাস তাঁর দোতলার ঘরে নিদ্রা যাচ্ছেন। হঠাৎ শেষ রাতে শুনতে নারী কন্ঠের আকুল কান্না। তখন তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে বললেন, যাও তো দেখে এসো তো, কাছেই বোধ হয় কারও বিপদ হয়ে থাকবে। গুরুজীর আদেশ শিরোধার্য করে শিষ্য দুজন বেড়িয়ে পড়লো। পরে তারা ফিরে এসে গুরুজীকে জানালো, দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগে একজন যুবক মারা গেছে। ঐ মর্মভেদী চীৎকার হচ্ছে যুবকের মায়ের। কোন মতেই তার কান্না থামানো যাচ্ছে না।

এই কথা শোনার পর গুরু অমরদাস কিছুক্ষণ যাবৎ চোখ দুটি বন্ধ করে ধ্যানে বসলেন। সেই সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন যাতে ঐ পুত্র নবজীবন লাভ করে। পরে তিনি শিষ্য দুজনকে ডেকে বললেন, তোমরা এখুনি চলে যাও সেই মৃত যুবকের কাছে। মৃতদেহের সামনে বসে ভক্তিভরে জপজীর প্রথম পৌরি আবৃত্তি করো। সেই সঙ্গে মৃতের মুখে ঢেলে দিতে থাকবে শীতল পানীয় জল। ভয় নেই, প্রভুর কৃপায় সে লাভ করবে নতুন জীবন।

গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে ইতস্তত করলো ঐ শিষ্য দুজন। তারা ভাবলে, গুরুজী তাঁর বিভূতির বলে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করবেন। আমরা তো উপলক্ষ্য মাত্র। সুতরাং জপজী আবৃত্তি করে আর মৃতের মুখে জল ঢেলে কি হবে! সবই তো তিনি করবেন। কি দরকার আমাদের অতো মাথা ব্যাথার!

এর চেয়ে বরং মৃত যুবকটিকে সোজা গুরুর সামনে নিয়ে আসা ভাল। যা করার তিনিই সব করবেন।

এই কথা ভাবার পর দেরী না করে তারা চলে গেল মৃতের বাড়ীতে। কিছুক্ষণ পর তারা মৃতদেহটিকে নিয়ে এলো গুরুজীর বাড়ীতে। তাদের সঙ্গে এলেন একদল কৌতূহলী লোক। মৃতের মাও উচ্চৈস্বরে কাঁদতে কাঁদতে এলো। গুরুজী তখন নিজের আসনে ধ্যানস্থ। মৃত যুবকটির মায়ের কান্না শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হলো।

তিনি মৃতদেহের সামনে আসন করে বসলেন। তারপর তার প্রাণহীন শরীরে সেচন করতে লাগলেন মন্ত্রপূত জল।

দেখতে দেখতে মৃত যুবকের শীতল ও প্রাণহীন শরীরে দেখা দিলো অভূতপূর্ব শিহরণ। ক্রমে সে হয়ে উঠলো একজন সুস্থ-সবল জীবন্ত যুবক। নবজীবন ফিরে পেয়ে যুবকটি প্রণাম জানলো গুরু অমরদাসকে। সেই সঙ্গে তার মাও গুরুজীর শ্রীচরণে পতিত হয়ে আনন্দাশ্রু সহযোগে ভক্তিপ্রণাম নিবেদন করলো।

গুরুজী এবার মা ও পুত্রকে করজোড়ে আশীর্বাদ জানালেন। তারাও গুরুজীর স্বর্গীয় আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। সারা বাড়ীতে পড়ে গেল আগেকার মত আনন্দে লীলাচঞ্চল উৎসব।

ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ **প্রণব ঘোষ**

তন্ত্র সাধনা শেষ হবার পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যোগারূঢ় অবস্থায় জানতে পেরেছিলেন বহুলোক ধর্মলাভের জন্যে তাঁর কাছে আসবে এবং অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁর ধর্মমত ভারতে এবং ভারতের বাইরে প্রচার করে যুগধর্ম প্রচারে সহায়তা করবেন। ঠাকুর প্রায় এক যুগ ধরে ঐ সকল ভক্তদের জন্যে প্রতীক্ষা করেছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি ভক্তদের বলেছিলেন - তোদের দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন করে উঠত, এমনভাবে মোচড় দিত যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পরতুম। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হত। লোকে কি মনে করবে ভেবে কাঁদতে পারতুম না, কোনরকমে সামলে থাকতুম। যখন দিন গিয়ে রাত

আসত, মন্দিরে মন্দিরে আরতির বাজনা বেজে উঠত, তখন আরও একটা দিন গেল – তোরা এলিনি, ভেবে আর সামলাতে পারতুম না; কুঠির উপরে ছাদে উঠে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে!' বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম আর ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। মনে হত পাগল হয়ে যাবো। তার কিছুদিন বাদে তোরা সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি, তখন ঠাণ্ডা হই।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই (স্বামী বিবেকানন্দ) ছিলেন সর্ববিচারে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর প্রতি ঠাকুরের স্নেহ ভালবাসারও কোন তুলনা ছিল না। প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে আসবার পরে স্বামীজী 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি প্রাণ মন ঢেলে যখন গাচ্ছিলেন, তখন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। পরে স্বামীজী চলে যাবার পর ঠাকুরের সে কি ব্যাকুলতা! ঠাকুর নিজেই বলেছেন, "তাকে দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ ঘন্টা এমন ব্যাকুল হয়ে রইল যে, বলবার নয়। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হত যে মনে হত বুকের ভেতরটা যেন কে গামছা নিংড়াবার মত জোর করে নিংড়াচ্ছে। ছুটে বাগানের উত্তর দিকে ঝাউতলায় যেয়ে 'ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না' বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতুম।" প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর কেমন ব্যবহার করেছিলেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, "আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাখন, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ এনে আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম আমাকে খাবারগুলি দিন, আমি এদের সাথে ভাগ করে খাইগে, তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, উহারা খাইবে এখন, তুমি খাও। বলিয়া সকলগুলি আমাকে খাওয়াইয়া তবে নিরস্ত হইলেন।"

স্বামীজী পাঁচ বছর ঠাকুরের সঙ্গ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঠাকুরের ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। স্বামীজীকে দেখলে ঠাকুর আনন্দে বিভোর হয়ে পড়তেন এবং শতমুখে তাঁর প্রশংসা করতেন। ঠাকুর সমদর্শী ছিলেন, কিন্তু নরেনের ক্ষেত্রে নয়। নরেনকে অসমভাবে ভালবাসতেন, তাঁর ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় অসমদৃষ্টি ছিলেন। অন্য কেউ খেল কি না খেল, তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, নরেন খেলেই হল, নরেন খেলেই ঠাকুরের শান্তি। একদিন একবাটি মা কালীর প্রসাদী মাংস নিয়ে ঠাকুর স্বামীজীর জন্য

অপেক্ষা করে বসে ছিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা বালকের ন্যায় কৌতুক করে মাংস চাইতে লাগল, কিন্তু ঠাকুর কাউকেও দিলেন না। বাটিভরা মাংস স্বামীজীর জন্য রেখে দিলেন। শেষে স্বামীজী এসে সেই মাংস খেলে ঠাকুরের তৃপ্তি হয়। ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ঠাকুরের এই অতিমাত্রায় নরেন্দ্র-প্রীতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। একজন ত বলেই ফেললেন, 'কেবল নরেন খাও, নরেন খাও, আমরা যেন গঙ্গার জলে ভেসে এসেছি।' স্বয়ং স্বামীজীও একদিন বলেছিলেনঃ এত নরেন নরেন করলে শেষে ভরত রাজার অবস্থা হবে। ঠাকুর অবশ্য তা মানেন নি। নরেনের জন্যে ঠাকুরের অত যে আসক্তি সেটা নরেনের খোলটির জন্যে নয়, তাঁর দিব্য সত্তার জন্য। নরেন্দ্রকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ ভাবতেন এবং এক একদিন নরেন্দ্রকে দেখেই গভীর ভাব সমাধিতে মগ্ন হতেন। শেষের দিকে ঠাকুর নিজের ও স্বামীজীর মধ্যে কোন ব্যবধান স্বীকার করতেন না। একদিন স্বামীজীর গা ঘেঁষে বসে বলতে লাগলেনঃ দেখছি কী (নিজের ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখিয়ে) এটা আমি, আবার এটাও আমি; সত্য বলছি, কিছুই তফাৎ বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেললে দুভাগ দেখায়, সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই - একটাই রয়েছে - বুঝতে পাচ্ছ? তা, মা ছাড়া আর কি আছে?

একদিন ভক্ত বৈকুন্ঠনাথ সান্যাল তামাক সেজে হুঁকোটি ঠাকুরের হাতে দিলে ঠাকুর দু'-এক টান টানলেন, তারপর হুঁকোটি ফিরিয়ে দিয়ে কলকেতে খাব বলে কলকেটি হাতে নিয়ে টানতে লাগলেন। শেষে নরেন্দ্রর মুখের কাছে ধরে বললেন, 'খা।' নরেন্দ্রকে সঙ্কুচিত দেখে ঠাকুর বললেন, তোর তো ভারি ভেদ বুদ্ধি! তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগিয়ে দু' তিনবার তামাক টেনে নিরস্ত হলেন।

সবশেষে ঠাকুর নরেন্দ্রকে সব দিয়ে ফকির হয়েছিলেন। অর্থাৎ নরেনের সত্তায় মিশে গিয়েছিলেন। সেই হিসেবে স্বামীজীতেই ঠাকুরের নূতন আত্মপ্রকাশ। এটি উপলব্ধি করেই গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন। "বিবেকানন্দকে রামকৃষ্ণ ব্যতীত যে মনে করে, সে অজ্ঞান।"

রাখাল মহারাজ

রাখাল মহারাজ - স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন ঠাকুরের মানসপুত্র। সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঠাকুর যখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন তখন এই

শুদ্ধসত্ব ভক্তের আগমন হয়। রাখাল মহারাজের আসার আগে ঠাকুর একদিন ভাবে দেখেছিলেন মা এসে একটি ছেলেকে তাঁর কোলে বসিয়ে দিয়ে বলছেন, "এইটি তোমার পুত্র।" শুনে ঠাকুর শিউরে উঠে বলেছিলেন, সেকি! আমার আবার ছেলে?" জগন্মাতা হেসে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সাধারণ সংসারী ভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র।

প্রথম দর্শনেই ঠাকুর চিনতে পেরেছিলেন রাখাল সামান্য নন, ব্রজকিশোর, শ্রী কৃষ্ণসখা। রাখাল মহারাজও প্রথম দর্শনের পরেই ঠাকুরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি শীঘ্রই আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হন। ঠাকুর যেন তার পথ চেয়েই ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর এখানে আসতে এত দেরী হল কেন?"

রাখাল মহারাজ শৈশবে গর্ভধারিনী মাকে হারিয়েছিলেন। তাঁর ভিতর তাই মাতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ঠাকুরের মধ্যে যেন তিনি নিজের মাকে খুঁজে পেলেন। তখন তাঁর চেহারা অনেকটা যুবকের মত হলেও ঠাকুরের কাছে যেন তিনি ক্ষুদ্র বালক। ঠাকুর বলেছেন, "তখন রাখালের এমন ভাব ছিল, ঠিক যেন তিন চার বছরের ছেলে। আমাকে ঠিক মায়ের মত দেখত। থেকে থেকে হঠাৎ দৌড়ে এসে কোলে বসে পড়ত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তন্যপান করত। বাড়ি তো দূরের কথা - এখান থেকে কোথাও এক পাও নড়তে চাইত না। আমাকে পেলে আত্মহারা হয়ে রাখালের ভেতর যে কেমন বালক ভাবের আবেশ হত তা বলে বোঝাবার নয়। তখন যে-ই তাকে ঐভাবে দেখত সেই অবাক হয়ে যেত। আমিও ভাবাবিষ্ট হয়ে তাকে ক্ষীর ননী খাওয়াতাম, খেলা দিতাম। কত সময়ে কাঁধেও উঠিয়েছি। তাতে তার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসত না।"

রাখাল মহারাজের পিতা ধনী ও বিষয়ী লোক ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের সাধুর সঙ্গে মিশে ছেলেও সাধু হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি ছেলেকে ঘরে আটক করে রাখতেন। তাতে অবশ্য ফল হত না। তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। এদিকে মানসপুত্র রাখালকে কাছে না পেলে ঠাকুর বড়ই কাতর হয়ে পড়তেন। মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে তিনি সজল নয়নে প্রার্থনা করতেন, "মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা। আমার রাখালকে এনে দাও।"

রাখাল মহারাজের সন্ধানে তাঁর বাবা দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুর তাঁকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেছিলেন যাতে তিনি রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে বা

সেখানে ইচ্ছামত থাকতে আপত্তি না করেন। ঠাকুরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। রাখাল মহারাজের পিতা খুশী মনেই ছেলেকে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, শুধু অনুরোধ করেছিলেন, "তবে মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্যে আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।"

ঠাকুর জানতেন, তাঁর মানসপুত্র সত্যই ব্রজের রাখাল। তিনি 'গোপাল' 'গোপাল' বলে নিজের হাতে তাঁকে খাওয়াতেন এবং কতই না আদর করতেন! অন্যে অন্যায় করলে ঠাকুর শাসন করতেন, কিন্তু রাখাল মহারাজ অন্যায় করলে ঠাকুর শাসন করতে ভুলে যেতেন, কখনও কখনও আনন্দও করতেন। একদিন খাওয়ার পর ঠাকুর বললেন, "ওরে রাখাল পান সাজ না, পান নেই যে!" রাখাল মহারাজ উত্তর দিলেন - "পান সাজতে জানি নে।" ঠাকুর বললেন, "সে কি রে? পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি? যা, পান সেজে আন।" এবারও রাখাল বললেন, "পারব না, মশাই!" এই অবাধ্যতায় ঠাকুর রুষ্ট না হয়ে বরং হাসতে লাগলেন। তিনি এই ভেবে খুশী হলেন যে রাখাল সত্যই তাঁকে নিজের বলে গ্রহণ করেছে, নতুবা সে অতটা অকৃত্রিম আচরণ করতে পারত না।

রাখাল মহারাজকে অন্য কেউ শাসন করলে বা রূঢ় কথা বললে ঠাকুর কষ্ট পেতেন। একবার রাম দত্ত মশাই কোনো বিষয়ে রাখাল মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে ঠাকুর তাঁকে বলেন, "রাখালের দোষ ধরতে নেই, ওর গাল টিপলে দুধ বেরোয়।" আবার অন্য কেউ রাখাল মহারাজ কে কাজের আদেশ দিলে ঠাকুরের সইত না। তিনি বলতেন, " আহা! ও দুধের ছেলে। ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস নি। ওর বড় কোমল স্বভাব।"

ঠাকুরের স্নেহ ও আদর পেয়ে রাখাল মহারাজের ধারণা হয়েছিল ঠাকুর যেন শুধু তারই। ধীরে ধীরে অন্য সব ভক্তেরা যখন আসতে লাগলো, রাখাল মহারাজ তাদের সহ্য করতে পারতেন না। ঠাকুর বলেছেন, "রাখালের মনে তখন বালকের মত হিংসাও ছিল। তাই আমার মনে কখনো কখনো তার জন্য ভয় হত। কারণ মা (জগদম্বা) যাদের এখানে আনছেন, তাদের উপর হিংসা করে পাছে তার অকল্যাণ হয়।" এরপর ঠাকুর একদিন ভাবচক্ষে দেখেন মা যেন রাখাল মহারাজকে সরিয়ে দিচ্ছেন। উদ্বেগব্যাকুল চিত্তে ঠাকুর তখন মা'র কাছে প্রার্থনা করেন, "মা, ওকে হৃদের মত সরাস নি। মা, ও ছেলেমানুষ, বোঝেনা- তাই কখনো কখনো অভিমান করে। যদি তোর কাজের জন্য ওকে

এখান থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিস, তাহলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে ওকে রাখিস।"

রাখাল মহারাজ এই সময় প্রায়ই জ্বরে ভুগছিলেন। কিছুতেই রোগের নিরাময় হয়না দেখে বলরাম বাবু তাঁকে বৃন্দাবন ধামে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। ঠাকুর সানন্দে সম্মতি জানালে রাখাল মহারাজ ব্রজধামে যান এবং দেহে মনে সুস্থ বোধ করেন। কিছুদিন পর আবার জ্বর দেখা দেয়। সে সংবাদ পেয়ে ঠাকুর উদ্‌বেগাকুল হয়ে বলেন, "রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল। যে যেখান থেকে এসে শরীর ধারণ করে, সেখানে গেলে প্রায়ই তার শরীর থাকে না।" তারপর মা জগদম্বার কাছে আকুলকন্ঠে প্রার্থনা করেন, "মা! কি হবে? তাকে ভাল করে দে, সে যে ঘর বাড়ি ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছে।" ঠাকুরের সে প্রার্থনা মা শুনেছিলেন। আরোগ্য লাভ করে মহারাজ কলকাতায় ফিরে আসেন এবং বাড়িতে কিছুদিন থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে যান। এখন আর মহারাজের আগের ভাব নেই। অন্য ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ-ভালবাসা দেখেও তাঁর মনে ঈর্ষা বা ক্ষোভ জাগে না, তিনি বোঝেন 'চাঁদমামা সকলেরই মামা।'

ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের সময় যতই নিকটবর্তী হতে লাগল, স্বামীজী ও মহারাজের প্রতি তাঁর স্নেহ ভালবাসাও তত উথলে উঠতে লাগলো। একদিন তাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনি স্নেহে বিগলিত হয়ে পড়েন এবং মুখে হাত দিয়ে শিশুর মত তাঁদের আদর করে বলেছিলেন, "শরীরটা কিছুদিন থাকতো তো লোকদের চৈতন্য হত। তা রাখবে না, সরল মূর্খ দেখে পাছে লোক সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে। মহারাজ তখন কাতর কন্ঠে তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি বলুন যাতে আপনার দেহ থাকে।" ঠাকুর সে প্রার্থনা করেন নি। তিনি জানতেন তাঁর বিদায়ের পরম লগ্নটি সমাগত। এই সময় ঠাকুর প্রত্যহ স্বামীজীকে দু-তিন ঘন্টা ধরে ভাবী সঙ্ঘ গঠন সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। একদিন উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন, "রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে।" তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্বামীজী বুঝেছিলেন ভাবী সঙ্ঘ-নায়ক পদে রাখাল মহারাজের অভিষেকই ঠাকুরের অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য, ঐ দুর্লভ পদের জন্য ঠাকুর আপন মানসপুত্রকে দীর্ঘ শিক্ষায় উপযুক্ত করে তুলেছিলেন।

জীবনের খেলাঘরে

শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য

ছোট ছোট বাধা দিয়ে
বাঁধা এই গাঁঠ
খুলতে না পারলে যেন
হবে বিভ্রাট!
পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাবে
চলবে যেই আগে
ছড়িয়ে যাবে জীবনময়
ছাড়াতে ব্যথা লাগে!
বাধার স্তুপ জমতে দিও না
সরাও একটি করে
যখনকার যা তখনই করো
রেখো না ফেলে পরে!
জীবনের কাল বড় বেশি নয়
চারটি দিনের খেলা
জায়গা নিজের করবে কোথায়
ভেবে নাও এই বেলা!
শিশুকালে নিশ্চিন্তে
মায়ের কোলে কাটে
কৈশোরেতে উদোম হাওয়ায়
ছোটে মাঠে ঘাটে!
যৌবনের দিনগুলোকে
যে যেমন চোখে দেখে
বার্ধক্যের অঢেল সময়
বে রঙ ছবি আঁকে।
হিসেব করে পা ফেলো তাই
জীবনের খেলাঘরে
আফশোষ করার দরকার নেই
বেলা শেষের পরে।

DO NOT COPY

খুঁজে ফেরা

সুনন্দন ঘোষ

নিজেকে চিনতে পারিনা আজকাল।

একটা সময় নার্সিসাসের মত হারিয়ে যেতাম
নিজের পৃথিবীতে;
আমি আর আমার প্রতিবিম্ব।

বাইরের আকাশে জ্যোৎস্না ছিল, গোধূলি ছিল।
কখনো জুঁই, কখনো গোলাপ,
কখনো চাঁপা, কখনো শিরীষ
ডাক পাঠাতো ইথারে।
বুক ভোরে নিতাম সেই সুবাস,
বুঁদ হয়ে থাকতাম।
আবার ফিরে যেতাম
যৌবনের প্রতিবিম্বের কাছে।

ক্রমশঃ বাড়ছিলো বাইরের হাওয়ার দাপট;
একটু একটু করে ঢেউ উঠছিলো জলে।
ভেঙ্গে যাচ্ছিল আমার প্রতিবিম্ব।

চোখের কোণে কাকপদ,
চুলে ধুসরতা,
এই আমাকে আমি চিনি না।

নতুন আমাকে চেনার জন্য একাকীত্বের দুর্গ ছেড়ে
নেমে এসেছি শ্যামল উপত্যকায়।
আকাশকে ফিরে পেয়েছি।
ফিরে পেয়েছি জুঁই, গোলাপ, শিরীষ, চাঁপার আলিঙ্গন।

এখন নিজেকে খুঁজে ফেরা বাকী জীবন ভর।

DO NOT COPY